IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস সৃষ্টিতে ইগোইজমের ভূমিকা

হিমাদ্রী শেখর হাওলাদার, জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

ইগো শব্দটি বর্তমানে বহু প্রচলিত হলেও এর ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। দার্শনিক ইয়াং জু চতুর্থ খ্রিঃ পূর্বাব্দে এই শব্দটি ব্যবহার করেন 'Yangism' (ইয়াংজিম) নামে। যার অর্থ করেন 'Everything for myself'। দার্শনিক Henry Sidgwisk এই egoism শব্দটিকে সবার সঙ্গে পরিচয় করান তার 'The methods of Ethies' গ্রন্থের মাধ্যমে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে। এরপর এর ব্যবহারিক যাত্রা ক্রমশ বেড়েই চলছে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার সাহিত্যে ফিউচারিজম আন্দোলনের সময় সাহিত্যিক সিভেরাইয়ানিন ইগো- ফিউচারিজম নামে একটি মতবাদ উদ্ভাবন করেন । পরবর্তীতে এটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। এছাড়া স্টানফোর্ড এনসাইকোপিডিয়া দর্শনে, উইকিপিডিয়া এই ইগো সম্পর্কে আলোচনা পাই। কিন্তু সবগুলোতেই সেই ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের সমতুল্য আলোচনা দেখতে পাই। যার উৎপত্তি স্থল আত্মমনের অন্তস্থল। সেখানেও মনের নানান চড়াই উৎরাই থেকেই এর উদ্ভব বলা হয়েছে।

ইগো হচ্ছে মানব মনের বৈশিষ্ট জাত একটি ব্যক্তিত্ব। তা কখন মনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থাতে থাকে আবার কখনো প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে। এটা যখন তখন উদয় হতে পারে। আবার এই অহং বা আমিত্বকে বাদ দিলে মানবের অস্তিত্ব টেকেনা। এটি সম্পূর্ণ ভাবে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। যার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও গিরিন্দ্রশেখর বসু তাদের স্বপ্ন বিষয়ক সমালোচনা গ্রন্থে। তারা সেখানে মানব মনের চরিত্র বোঝানোর জন্য Id, Ego, Super-Ego দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিষয়টাকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রানুসারে Ego শব্দের সমার্থক পাই 'অহং'। এর সঙ্গে ism শব্দ যোগ করে পাই 'বাদ'। যার সম্পূর্ণ অর্থ দাঁড়াচ্ছে অহংবাদ। ইগোইজমের বাংলা পরিভাষা নিয়ে এগোলে অর্থের দিক দিয়ে মানানসই হবে না বলে আমরা ইংরেজি ইগো বা ইগোইজম শব্দটিকেই ব্যবহার করব। বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় এই ইগোইজমের প্রয়োগ খুব কম দেখা যায়। আলোচকরা এটাকে মনস্তত্ত্বের দ্বারা বিশ্লষন করে থাকেন। তবে সাহিত্যে এর প্রভাব শক্ত পোক্ত ভাবেই দেখা যায়। সাহিত্যিকরা তাদের রচনায় মনস্তাত্ত্বিক বা দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাসের প্লট নির্মাণে ইগোর ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে চরিত্রের দ্বারা পরিচলিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে। আর এই ইগোকে কখনও ঈর্ষা, অভিমান, অহং অথবা প্রতিহিংসার মাধ্যমে তুলে ধরেন। আর এই চরিত্রগুলো পাঠক মনে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। লেখকগণ তাদের প্লটের চরমতম পরিস্থিতি নির্মাণে এর সাহায্য নিয়ে থাকেন। তা কখনও উপন্যাসের শুরুতে অথবা মাঝখানে অথবা উপন্যাসের অন্তিম পর্বে। তবে বেশির ভাগ প্রথম ও মধ্যম পর্বেই এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এবং তা গড়িয়ে ক্লাইম্যাক্সের দিকে টেনে নিয়ে জান। যা অবশেষে সমাধান হিসেবে সুপার ইগোর মাধ্যমে মিটমাট করে পরিসমাপ্তি ঘটান। তাই একটি দ্বন্দ্বমূলক মনস্তাত্ত্বিক সার্থক উপন্যাস নির্মাণে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

এখানে আমরা ইগোকে ব্যবহার করেছি অতি সহজ সরল অর্থে। অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক কথা বলা চাল-চলনে যে ভাবে এই ইগো শব্দের ব্যবহার করি একটি বহুল চলতি শব্দ হিসেবে। বিশেষ করে সমাজে একে অপরকে যে অর্থে প্রয়োগ করি ছোট-বড়, আত্মীয়-স্বজন, অফিস আদালত ইত্যাদি ক্ষেত্রে। এটা আজ একটি সামাজিক ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। সমাজের অতি ছোট থেকে সর্বোচ্চ স্তরে এই অহং এর প্রচলন পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু এখানে এটার আলোচনা কোন দার্শনিক তত্ত্বের গভীর আলোচনার দিক থেকে আলোচিত করা হচ্ছে না। অতি সহজ সরল দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা মাত্র। আর তাকে কেন্দ্র করে এই প্রস্তাবিত প্রবন্ধ নির্মান করা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল লেখকের উপন্যাসের মধ্যে এই ইগোর প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে উপন্যাসের চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে এই ইগোর দ্বারস্থ হতে হয়েছেন। লেখকগণ সূত্রাকারে অল্প অল্প করে জমাট বাঁধিয়ে গল্পের চরমতম ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যা ক্রমশ গল্পকে মূল গ্রন্থিতে আবদ্ধ করে। মূল গল্পের তুলনায় এর উপস্থিতি অতি সূক্ষ্ম। সাধারণ পাঠকের চোখের আড়ালে নির্মিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্রতার মাত্রা কত বৃহত্তর হতে পারে তা বোঝা যায় তখনই যখন এটি মূল কাহিনীর পরিচালক হিসেবে কাজ করে। আবার এই ক্ষুদ্রতাকে এড়িয়ে গেলে জটিল দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাসও পরিণতি লাভ করে অতি সাদামাটা একটি সরল গল্প হিসেবে। যা পাঠক মহলের কাছে শ্রেষ্টত্বের আসন ছেড়ে চলে যায় বহু দূরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশ কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের মধ্যেও এর প্রতিফলন রয়েছে। আর এর প্রভাবেই উপন্যাসগুলোকে বিখ্যাত হতে সাহায্য করেছে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী ইত্যাদি সকল লেখকের রচনার মধ্যে এর অস্তিত্ব দেখা যায়। মানব মনের প্রকৃতিকে লেখকগণ তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । সাধারণ রক্ত মাংসের তৈরি মানুষের চরিত্রেরই একটি অংশ আত্মগরিমা প্রকাশ করা। ব্যক্তির আত্মা অন্যের দ্বারা বিনা অপরাধে পদদলিত হলে তখনই ঘটে বিপর্যয়। আর ব্যক্তি মর্যাদায় আঘাত পেলেই জেগে ওঠে আত্মগরিমা। আর তখনই সে নিজের ব্যক্তিগত সুখ শান্তির চাহিদাকে ফিরে পাওয়ার আশায় সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ফিরে পেতে চায় হারিয়ে যাওয়া নিজ স্থান। বেঁধে যায় অন্যের সাথে সংঘাত। হ্রাস পায় তখন হিতাহিত জ্ঞান। যা অন্যের কাছে প্রকাশ পায় একটি স্বার্থপর চরিত্র হিসাবে। আর এই চরিত্রগুলোই বেরিয়ে আসে কখনো মূল চরিত্রের সমান্তরালে ভিলেনের বা খলের ভূমিকায়, কখনো কেন্দ্রীয়, কখনও আবার পার্শ চরিত্রের ভূমিকায়। এদের অবজ্ঞা করলে মূল গল্প হারিয়ে যায় অতল গহ্বরে।

উপরিউক্ত লেখকদের মধ্যে দু'জন রচনাকারের একটি করে জনপ্রিয় উপন্যাসকে নির্বাচিত করে নেওয়া হয়েছে। যথা- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি'কে। গল্পের চরিত্রগুলোকে বেছে নিয়ে দেখানো হয়েছে নির্মিত চরিত্রগুলো কখন কোথায় তারা ইগোর দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এবং ইগোর দ্বারা তাড়িত হয়ে কেমন করে কাহিনিকে একটি সার্থক দ্বন্দ্বমূলক মনস্তত্ত্ব উপন্যাস তৈরি করতে সাহায্য করেছে। একটি জটিল ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস তৈরিতে ইগোইজমের কি ভূমিকা সেটাকে আলোকপাত করাই এই গবেষণামূলক রচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

আমির অস্তিত্ব বাস্তব জীবনে দেখা যায় ইগোর মাধ্যমে। আর সমাজ ও সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে ভরপুর মাত্রায় পাওয়া যায়। যা ঘৃণা লজ্জা ভালোবাসা বাসনা অবহেলা অপমান ইত্যাদি ধরনের অভিজ্ঞতার দ্বারা সৃষ্টি করে। এটা মানুষের মনে মুহুর্তের মধ্যে উদয় হয়। আমরা এই ইগোকে যথা- ১। ক্রোধ, ২। সম্পর্ক, ৩। অহংকার, ৪। হিংসা, ৫। প্রতিঘাত, ৬। বাসনা ও ৭। লজ্জার মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। যাকে বলে ইগোর খেলা।

১। ক্রোধঃ

এটা অদ্ভুত ভাবে চলাচল করে। অশিক্ষার মধ্যে যেমন দেখা যায় ঠিক শিক্ষিত মহলেও এর প্রভাব দেখা যায়। এটা বজ্র সম কাজ করে। ক্রোধ জন্মানোর কোন স্তর ভেদ নেই। সমাজের সর্বত্র এর উৎপত্তি স্থল। তবে ধ্বংসের পরিমানটা স্তরের উপর নির্ভর করে। যেমন রাজায় রাজায় হলে গোটা দেশ ধ্বংস হয়। তবে কোন ক্ষুদ্র স্তরে শুরু করে গোটা জাতি নষ্ট হয় না। তবে অবস্থান বা চিন্তার ক্ষমতাকে কখনো অতিক্রম করে না। এটা একটা সীমার পর থেমে যায়। যেহেতু এর কোন সীমা নেই বলে। সবার মধ্যে এটি কম বেশি প্রচলন থাকে। ক্রোধের মধ্যে হিংসার স্থান নেই। তবে হিংসার স্থলে ক্রোধ প্রবল শক্তি যোগায়। আর নিজের উপর নিজের ক্রোধ হলে সে ক্রোধ পরে সিদ্ধি লাভ করতে সাহায্য করে। প্রজাও রাজায় পরিণত হতে পারে। তবে হিংসার পথ ধরে গেলে সে নিজেই নিজের ধ্বংস সাধন করে।

২। সম্পর্কঃ

সম্পর্ক সংক্রান্ত ইগোতে থাকে প্রণয় ভালোবাসার সম্পর্ক। এই ভালোবাসাকে কাছে পেতে চায়। কাছে না পাওয়ার জন্য তৈরি হয় অভিমান। অভিমান থেকে অভিযোগে পৌঁছায় যা ভালোবাসার প্রত্যখ্যান থেকে গড়ে ওঠে। এর পর সেই প্রত্যখ্যান ধীরে ধীরে আরও কাছে পেতে চায়। এই পাওয়া আস্তে আস্তে গাঢ় হতে হতে তাকে যেকোন মূল্যে পেতে চায়। দরকার হলে তাকে পরাভূত করে কাছে পেতে চায়। তখন পরাভূত করার প্রক্রিয়া চালু হয়। ছলে বলে কৌশলে তা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। যখন দেখে কোন ভাবেই কাছে পায় না বা কার্য সিদ্ধি হচ্ছে না। শেষ পর্বে সেটা আঘাত দিতে থাকে। অবশেষে তাঁদের মধ্যে বিরোধী মনোভাবের উৎপত্তি হয়। এই প্রক্রিয়া অধিক সময় চলতে থাকলে তাঁদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে চির বিচ্ছেদের রূপ ন্যায়। একে অপরকে আঘাত ও প্রতিঘাত দিতে থাকে। অবশেষে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যু এর সমাপ্তি ঘটায়। আবার অন্য পথও দেখা যায় যেখানে বিপরীত পক্ষ পরাভূত হলে খুব ভালো তখন তার সংস্পর্শে এসে নিজেকেই সমর্পণ করে। তাদের মিলন ঘটে। তখন তার মধ্যে হিতাহিত জ্ঞানের ক্ষমতা লোভ পায়। সমাজের ভাষায় যাকে বলে থাকে অনাচারী। আর যে ওটাকে কাটিয়ে সরল পথে বেরিয়ে যেতে পারে সে হয় প্রতিষ্ঠিত। তখন অন্য পক্ষ বেরিয়ে গিয়ে ভিলেনের কাঠ গড়ায় দাঁড়ায়। অথবা মন্দ মনের লোক বলে পরিচিত লাভ করে।

৩। অহংকারঃ

অর্থ-শিক্ষা-সামর্থ এবং ক্ষমতা দিয়ে নির্মিত অহংকার বা ইগো। তবে সব ক্ষেত্রে এই সব গুণাবলীর দরকার পড়ে না। যেকোন একটি বর্তমান থাকলেই সে অহংকারের বশীভূত হয়। অর্থবানের কাছে অন্য যারা তার নিম্নে অবস্থান করে তাদের প্রতি। শিক্ষিতের দ্বারা কম

শিক্ষিতের প্রতি। সমর্থের দ্বারা অসমর্থ বা দুর্বল লোকের উপর। ক্ষমতাবানের কাছে তার নিম্নে যারা অবস্থান রত ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই ইগো দেখা যায়। আর এগুলো যাদের মধ্যে বর্তমান তাদের মধ্যে উচ্চ ক্ষমতাকে কুর্নিশ করার প্রবণতা ব্যাপক আঁকার থাকে। আবার এর ব্যাতিক্রমও আছে। যার মধ্যে উক্ত সব গুণাবলী থাকা সত্তেও সে উচ্চ ক্ষমতাকে পাত্তা দেয় না। তার মধ্যে দাসত্ব মনোভাব কাজ করে না। তারা তাদের অহংকারকেই বড় সম্পদ হিসেবে ধরে নেয় এবং সেটাকেই উচ্চ স্তরে তুলে চলেন। তার জন্য মৃত্যুকেও পরোয়া করে না। সে কাউকে পাত্তা দেয় না। তবে সে অন্যের ক্ষতির চেষ্টাও করে না। অপর অহংকারী সে অন্যের ক্ষতির জন্য চেষ্টা করে। তার এই ইগোকে সবার উপরে তোলার জন্য সব কাজ করতে পারে। এমন কি প্রতিপক্ষের সর্বনাশ করতেও পিছপা হয় না। এখান থেকে তার মধ্যে হিংসার জন্ম ন্যায়। যা পরবর্তীতে প্রতিহিংসার রূপ নিয়ে অন্যকে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়। তবে এত দূর খুব কম ঘটে থাকে।

৪। হিংসাঃ

হিংসার ইগো অনুরূপ থেকে গড়ে ওঠে। তবে এটা অর্থ- শিক্ষা- ক্ষমতার যে কোন একটির উপস্থিতিতে উৎপত্তি হতে পারে। আবার এর প্রভাব না থাকলেও এটি তৈরি হতে পারে। আর এটা খুব ক্ষতিকারক। ধীরে ধীরে গোটা সমাজকেও আক্রান্ত করতে পারে। এর জন্য শিক্ষার প্রোয়োজন হয় না। এটা ছোট খাটো থেকে শুরু করে বিশাল আকার ধারন করতে পারে। আবার কখনো ব্যাক্তিগত সীমার মধ্যেও আটকে থাকে। এটা শিক্ষা, কাজের জায়গা, কথা-বার্তা অথবা চাল-চলনের মধ্যে দেখা যায়। এর কার্য ব্যাক্তির জ্ঞানের পরিধির উপর নির্ভর করে। সমাজের সব শ্রেণীর স্তরেই দেখা যায়। তবে নিম্ন স্তরে এর বেশি দেখা যায়। কারন এই স্তরে লোকের সংখ্যা বেশি বলে। এটা স্তর ভেদ করে খুব কম। নিজের শ্রেণী গোষ্ঠীর মধ্যে বেশি আটকে থাকে। আবার রাজায় রাজায়ও হয়ে থাকে। এটা বেশি পরিচিত জানাশুনার মধ্য থেকে যাত্রা শুরু করে। অপরিচিত ব্যাক্তির মাধ্যমে খুব কম গড়ে ওঠে। অধিকতর স্থানে প্রতিপক্ষকে জানবে দেখবে বুঝবে তারপর এর উৎপত্তি হয়। অপরিচিতের মধ্যেও হয় তবে তার পরিমান খুব কম।

৫। প্রতিঘাতঃ

এর উৎপত্তি হয় চরমতম আঘাতের দ্বারা। ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে শুরু করে সমাজ শিক্ষা অর্থ ধর্ম রাজনীতি ভালোবাসা ইত্যাদি সংক্রান্ত স্থান এর উৎস স্থল। যেখানে ইমোসন জড়িয়ে থাকে। এই ইমোসনে আঘাত লাগলেই তার প্রতীকার খোঁজার চেষ্টা করে। তখন তাকে প্রতিঘাত করতে দেখা যায়। সেখান থেকেই এর যাত্রা শুরু।

৬। বাসনাঃ

লোভ থেকে বাসনার উৎপত্তি হয়। কোন কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইচ্ছা বা চাওয়া বা বাসনা করলেই এটা উৎপন্ন হয়। এটা যে কোন প্রাণী বা লোকের মধ্যেই বর্তমান। লোভ বা লালসাহীন প্রাণীর সংখ্যা খুব কম। তাই এর স্তরটা খুব হাল্কা। সমাজের সর্বত্র এটি ছড়িয়ে আছে। এটা চরিতার্থ করতে সবার আগে নিজেই নিজের শিকার হয়। নিজেই নিজেকে খেয়ে নেয়। লোভ থেকে হিংসার জন্ম হয়। তাকে অন্ধ ভাবে পাওয়ার চেষ্টা করে। তাই একে অপরকে আক্রমন করে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটায়। বাসনার মধ্যেই এর জন্ম।

৭। লজ্জাঃ

এটা কার্যের পর উৎপত্তি হয়। কোন কিছু কাজ করার পর তার মধ্যে যখনই বাস্তব ন্যায়-অন্যায় অনুশোচনা ধর্মী জ্ঞান চলে আসে তখন এটা উৎপত্তি হয়। এটা পরবর্তীতে নিজেকে হীন মনের অধিকারী ভেবে কারও সামনে আগের মত উপস্থাপিত করতে পারে না। অপরাধ বোধ তাকে আবদ্ধ করে রাখে। আর তখনই এই লজ্জা ধর্মী ইগো দেখা যায়।

এবার আমরা দেখব সাহিত্যে এর কেমন ব্যবহার রয়েছে

কৃষ্ণকান্তের উইলঃ

গল্পের শুরুতেই মনোমালিন্য দেখতে পাওয়া যায়। আর সেটা সম্পত্তির স্বার্থের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। পিতা কৃষ্ণকান্ত ও পুত্র হরলালের মধ্যে বিষয় সম্পত্তির প্রাপ্ত উইল নিয়ে। সেটা এমন পর্যায় চলে যায় যেখানে হরলালের ভাগে সম্পত্তি শূন্য পড়ে। আর এর পিছনেও রয়েছে কৃষ্ণকান্তের সন্মানহানীর ইগো। যার উৎস হচ্ছে বিধবা বিবাহের হুমকি। এখানে লজ্জা ইগোর প্রভাব দেখা যায়। (৭)

এরপর দেখা যায় হরলাল ও রোহিনীর কথোপকথনে- ‘আমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিনী করিতে পারিবনা’ এই কথা শুনে রোহিনীর আঁতে ঘা লেগেছে- ‘আমি চোর! তুমি সাধু। কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল ..... হায়। আমি অযোগ্য? তোমার মত নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই। তুমি যদি মেয়ে মানুষ হইতে তোমাকে আজ, যা দিয়ে ঘর ঝাঁট দিই, তাই দেখাইতাম’। এখানে ভালোবাসায় অতি আঘাত পেয়ে এমন প্রতিশোধ বাক্য ব্যাবহার করেছে কারণ তার ইগোতে লেগেছে। যা সম্পর্ক ইগোর মধ্যে পড়ে। (২)

১০ম পরিচ্ছেদে রোহিণী উইল চুরির দায়ে ধরা পড়ে গোবিন্দলালের সাথে রোহিণীর কথা বলা শুরু হয়। ১২ পরিচ্ছেদে তাদের মধ্যে ভালোবাসার বীজ বপন হয়েছে-‘কলঙ্কে, বন্ধনে রোহিণীর প্রথম প্রেম’ অর্থাৎ ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়েছে। যা সম্পর্ক ইগোর মধ্যে পড়ে। (২)

১৯ ও ২০ পরিচ্ছেদে ভালোবাসার প্রতি মান অভিমান দেখা যায় ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধ্যে। ২৩শে- ভালোবাসা থেকে অভিমানের জন্ম হয়েছে- অভিমান ক্রমশ গাঢ় হয়ে অভিযোগে পরিণত হয়েছে। ভ্রমরের মধ্যে ইগোর সূচনা- ' যতদিন তুমি ভক্তিযোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি, যতদিন তুমি বিশ্বাসী ততদিন আমারও বিশ্বাস..... ভক্তিও নেই, বিশ্বাসও নেই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই'। এখানেও সম্পর্ক ইগো। (২)

লেখকই এখানে প্রকাশ করেছেন 'হয়ত রাগে অভিমানে আর দেখাই হয় নাই'..... 'ভ্রমরের এত ভ্রম ঘটিত না। এত রাগ হইত না। রাগে এই সর্বনাশ হইত না'। এর পর ভ্রমরের রাগের মাত্রা বৃদ্ধি হতে থাকল। গোবিন্দলাল মহল থেকে ফিরে এসে শুনে মাতার কাছে পত্র লিখল। তারপর থেকে ইগো সেন্সের মাত্রা বাড়তে লাগলো। অভিমান থেকে অভিযোগে পরিণত হয়ে ক্রোধের উৎপত্তি। একে আমরা ক্রোধ ইগো বলতে পারি। কিন্তু উৎপত্তি প্রণয় ভালোবাসা থেকে তাই এটি সম্পর্ক গোত্রের অন্তর্ভূক্ত। (২)

এরপরেই গোবিন্দলালের পরিবর্তন দেখা যায় - 'মনে মনে বড় অভিমান হইল... এত অবিশ্বাস? না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া, আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল? আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণ ধারণ করিতে পারে না?' এখানেও একই ইগোর সূত্র দেখা যায়। 'ভ্রমরের বড় স্পর্ধা হইয়াছে, তাহাকে একটু কাঁদাইব। বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কাঁদাইব'। বেদনার দ্বারা যদি আবার তাদের মিলন ঘটে কিন্তু তা ঘটল না। অভিমান থেকে তার ভালোবাসার লোককে প্রথমে হাল্কা করে দুঃখ বেদনা দেওয়া বা কষ্ট দেওয়া। এই বেদনা বা আঘাত পুষ্ট হয়ে প্রতিঘাতের রূপ নিয়ে মারাত্মক আঁকার ধারণ করেছে। ভালোবাসার লোককে কষ্ট দিয়ে সে বেদনার জ্বালা নিজেকেও সইতে হয়েছে। তা দেখতে পাই- 'শূন্য-গৃহ দেখিয়া আপনি একটু কাঁদিলেন'। এর পরে গোবিন্দলালের রাগ বাড়তে থাকে অবশেষে প্রতিশোধ নেবার পালায় পৌঁছায়। এটি সম্পর্ক ইগো পর্যায় পড়ে। (২)

চতুর্থ উইলে যখন ভ্রমরের নামে আট আনা সম্পত্তি এবং গোবিন্দলাল ভাগে শূন্য পেল তাতে গবিন্দলালের মনে পুরুষতন্ত্রের অহংকার ইগো জেগে উঠলো। তাই বলল- 'স্ত্রীর দানে দিনপাত করিতে হইবে? আর কিছু দিন আগেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ইগোর লড়াই হয়ে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে আছে। তার সমাধা হয়নি বরং তার মধ্যে বিষয় সংক্রান্ত উইলের প্রবেশ। ফলে আগের ইগো ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ইগো এসে ক্রোধের পরিমাণ আরও বেড়ে গেল। তখন ভ্রমর থেকে দূরে থাকাই সংকল্প হল। আর এই সংকল্পের পিছনে আরও একটি কারণ আছে। সেটা হল রোহিণীর প্রবেশ। তবে রোহিণীর রূপে ভোলার পিছনে প্রথমে তার ইগো কাজ করেনি। কারণ ভালোবাসা ইগোর উপর নির্ভর করে না। কিন্তু এটি সম্পর্কের মধ্যে আসে। (২)

৩০ পরিচ্ছেদে দেখা যায় ভ্রমর উইল পাল্টে গোবিন্দলালকে দিল এবং গোবিন্দলাল ফিরে পাবার জন্য ভ্রমর অনেক কাকুতি-মিনতি করছে। সব ইগো ত্যাগ করে নিজেকে সম্পুর্ন ভাবে উজার করে আত্ম সমর্পণ করেছে। তারপরেও গবিন্দলাল তাকে অবজ্ঞা করে দূরে ঠেলে দিয়েছে। তখন ভ্রমরের মনে পুনরায় ইগোর জন্ম হল কিন্তু ততক্ষণে গোবিন্দলাল রোহিণীতে ডুবে গেছে। এবং সে অভিশাপ দিল যে তাকে আবার এই ভ্রমরের কাছে ফিরে আসতে হবে। এখানে সম্পর্ক ইগো কাজ করেছে। (২)

গোবিন্দলাল ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় আবার ঘরে ফিরে যাবার ইচ্ছে মনে এসেছিল কিন্তু তাকে ফিরতে দেয়নি তার লজ্জা ইগো ফলে তার ইগোকে বজায় রাখতে গৃহহীন হতে হল। এখানে লজ্জা ইগো কাজ করেছে। (৭)

২য় খণ্ড চলৎ শক্তি পেল যখন প্রবেশ করল ভ্রমরের বাবা মাধবী নাথ। মেয়ের দুঃখ দেখে তার মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। তিনিও প্রতিজ্ঞা করলেন এই দুঃখের জন্য যে দায়ী তাকে শাস্তি দেবেন। যদি গোবিন্দলাল ও রোহিণীর সন্ধান করে খোঁজ খবর না করতে পারে তাহলে বৃথাই পৌরুষের শ্লাঘা। চরম ইগোর দেয়াল প্রতিপন্ন হল। তার এই ইগোকে দমন করার জন্য কাজে লেগে পরলেন। এখানে ক্রোধ ইগো কাজ করেছে যা ইগোর মধ্যে শ্রেষ্ট। (১)

এরপর প্রসাদপুরে দেখতে পাই গোবিন্দলাল রোহিণীকে ধরে এনে ক্রোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে রোহিণীকে গুলি করে হত্যা করলো। ক্রোধ ইগো যে কত বড় হতে পারে তা হাতে নাতে দেখা গেল। এই ইগোর পিছনে আছে গোবিন্দলালের অনুতাপ। সব পরিত্যাগ করে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধল। আর সেই নারী তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করল। ফলে তার মধ্যে ক্রোধ আরও অধিক আঁকার ধারণ করল। অতীতের পাপ স্খলনের এমন সুযোগ হাত ছাড়া করল না। তাকে মরনের ঘাটে পৌছে দিয়ে সে স্থান ত্যাগ করল। এটি সম্পর্ক ইগো কাজ করেছে। (২)

বাসনা হচ্ছে এক প্রকার চাহিদা। সেই চাহিদা যেন তেন প্রকারে পাবার ইচ্ছা হয়। তবে এই বাসনা বেশি সময় স্থায়ী হয় না। পাওয়া হয়ে গেলে ভোগ করে ফেলে দেওয়া হয়। তবে যতক্ষণ তাকে না পাওয়া যায় ততক্ষণ তাকে পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা থাকে। এটা ক্ষণিকের বলে তা ইগোতে পরিণত হয়। এই ইগোর দ্বারা পরিচালিত হয়ে পাওয়ার জন্য ছলনা করতেও ভোলে না এবং পাওয়া হলেই ইগো দমন হয় এবং পরে তাকে পরিত্যাগও করে দেয়। যা গোবিন্দলালের মধ্যে দেখা যায়। এখানে বাসনা ইগো কাজ করেছে। (৬)

গোবিন্দলাল যশোরের জেল থেকে ফাঁসি রোধ করার জন্য ভিক্ষা চেয়ে দেওয়ানের কাছে চিঠি লিখল। যাতে ভ্রমর জানতে না পারে। কারণ সে ভ্রমরের কাছে ছোট হয়ে যাবে। অর্থাৎ জীবন গেলেও অহংকে ছোট করা যাবে না। এই নিজেকে লুকানোর পিছনে তার লজ্জার ইগো কাজ করছে। এখানে লজ্জা ইগো কাজ করেছে। (৭)

গোবিন্দলালের কিছু ইগোর সমাপ্তি ঘটেছে যখন তার অর্থ শেষ হয়ে গেছে কোলকাতায় বসে। তখন সে ভিক্ষা করে দিন যাপন করত। অর্থই যে ইগোর প্রধান শক্তি তা দেখা গেল। তার অর্থ শেষ হতেই ইগো ত্যাগ করে ভ্রমরের কাছে চিঠি লিখল। কিছু অহংকার লুপ্ত হয়েছে। এরপরেও ভ্রমরের কাছে আসতে পারে নি। কারণ অপরাধ বোধ কাজ করেছে। লজ্জা তাকে বাঁধা দিয়েছে। এখানে লজ্জা ইগো কাজ করেছে। (৭)

মরিয়া যে ইগোর শেষ হল তা দেখা যায় ২য় খন্ডের ১৪ পরিচ্ছেদে। ভ্রমরের স্বীকারূক্তিতে পাই ৭ বছর আগে স্পর্ধা করে বলেছিল 'আবার দর্শন হবে'। অবশেষে দেখা হল তার মৃত্যু শয্যায় -'আজ আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই'- এই বলে তার সকল ইগোর ইতি সমাপ্তি ঘটল। গোবিন্দলাল সব ত্যাগ করে সন্যাসী হয়ে গেল। যেখানে সকল ইগোর পরিসমাপ্তি হয়। তবে পরের জন্মে তোমাকে আর স্বামী হিসেবে চাই না। এই 'না' বলা থেকেই কিছু ইগো নিয়ে চলে গেছে। এখানেও অভিমান দেখা যায়। তাই এটা সম্পর্ক ইগোর মধ্যে পড়ে। (২)

রোহিণীর মৃত্যুর জন্য আমরা মাধবী নাথের ইগোকে দায়ী করতে পারি। সে যদি নিশাকরকে নিয়ে প্রসাদ পুর না যেত তাহলে রোহিণী তার ছলনার শিকার হয়ে অপঘাতে মৃত্যু হোত না। যদিও ভ্রমরের দুঃখ-কষ্টই তাকে এই ধরনের প্রতিহিংসার দারস্ত হতে বাধ্য করেছে এখানে ক্রোধ ইগোর কাজ করেছে (১)।

গোবিন্দলাল অহংকারে অর্থাৎ ইগোতে পরিপূর্ণ ছিল। অন্তে তাকে সন্যাসী বেসে দেখি তখন তার মধ্যে ইগোর ছাপ থাকে না। লেখকই বলে গেছেন যে- শুধু পুরুষ জাতি অহংকারে পরিপূর্ণ। সেখানে আমরা বলতে পারি মানব জাতিই অহংকারে পূর্ণ।

চোখের বালিঃ

যে যেমন ভাবে বা চিন্তা করে সে অন্যকে তার নিজের সেই মাত্রা জ্ঞানেই দেখে। রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণার সংলাপে তা প্রমাণ। রাজলক্ষ্মী অন্নপূর্ণার উদ্দেশে বলছে- 'পুত্র সৌভাগ্যবতীকে পুত্রহীনা ঈর্ষা করিতেছে'। ঈর্ষাকাতর বা ইগোর দ্বারা পরিচালিত রাজলক্ষ্মী সর্বদা অন্যকে খাটো করে দেখে ও কথা বলে। নায়ক মহেন্দ্র অন্নপূর্ণার ঘর থেকে বেরোনোর সময় পানের অজুহাত দিলে সঙ্গে সঙ্গে মাতা বলে-'তোর পান তো আমার ঘরে সাজা আছে'। এখানে দেখা যায় তার ছেলেকে অন্য কেউ ভালোবাসে বা সোহাগ করে সেটা তার সহ্য হয় না।

ছেলে পিছে হাত ছাড়া হয়ে যায় এই ভয়ে। মহেন্দ্র আশাকে দেখে পছন্দ হলে সেটাকেও অন্নপূর্ণার চক্রান্ত বলে দাবী করে। অন্যকে সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখাও সাইকোলজিক্যাল ইগোর সমস্যা। এই ঘটনাতে ইগোর মাত্রা বেড়ে দ্বিগুণ হল। মায়ের মতো ছেলেও জেদি – 'মেয়েটিকে আমার বেশ পছন্দ হইয়াছে মা'। এখানে হিংসা ইগো দেখা যায়। (৪)

জায়ের কাছ থেকে মিথ্যে অভিযোগে অন্নপূর্ণার ইগো হট হওয়াতে সে বিহারীকে বিয়ে করতে রাজি করায়। কিন্তু রাজলক্ষ্মী জানে তার ছেলেকে –'সে যাহা চায়, না পাইলে যাহা-খুশি করিতে পারে'। তার ছেলেও একজন সার্থক ইগোইস্ট। সন্তান স্নেহে মাতা তার নিজের ইগোকে জলাঞ্জলি দিতে যা খুশি তাই করতে পারে-'আমার মাথা খাও মেজো বউ তোমার পায়ে ধরি'। নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে মানুষ তার ইগোকে সর্বচ্চ স্তর থেকে সর্ব নিম্নে নামতেও পিছ্ পা হয় না। যাকে অবজ্ঞা করে চলন-বলন কথনের দ্বারা মুহুর্তে মধ্যে তাঁরই পায়ের কাছে মাথা নিচু করে দেয়। কার্য সিদ্ধাই এক মাত্র উদ্দেশ্য। এখানে অহংকার ইগো কাজ করেছে। (৩)

আবার বিহারীর বিয়েতে বাঁধা হওয়ায় সে অপমান বোধ করে তাই সে বলে -'আমাকে আর কখনো কাহারও সঙ্গে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিয়ো না'। এই ধরনের ইগো অপমান অবজ্ঞা ঘৃণার মাধ্যমে জন্মায় বা ব্যাক্তিগত সম্পর্কের মধ্য থেকে। এখানে লজ্জা ইগো কাজ করেছে। (৭)

অভিমান ইগোরই অংশ যা অতি স্নেহ ভালোবাসার দ্বারা পুষ্ট। ৪র্থ পরিচ্ছেদে দেখতে পাই রাজলক্ষ্মী অভিমানী হয়ে ছেলে-বৌকে কোন ভাবেই ক্ষমা করবে না বলে দরজা বন্ধ করে রাখে। কিছুক্ষণ পরে নিজেই গিয়ে তাদের ক্ষমা করে দিয়ে আসবে বলে তার ইগোকে পাশে সরিয়ে রাখে। আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা হলেও মনের মধ্যে তা সুপ্ত অবস্থাতেই বিরাজ করে। অবশেষে নিজের ইগোকে বিসর্জন দিয়ে অন্যের ইগোকে স্বীকৃতি দান করতে দেখা যায়। আশা এসে মহেন্দ্রের বিপর্যায় ঘটিয়েছে। তার এই সুপ্ত ক্রোধ গিয়ে পরে অন্নপূর্ণার উপর। ছেলের উপর অভিমান দিনে দিনে ক্রোধে পরিণত হয়। ইগোর দ্বারা ইগোকে চাপা দিয়ে বিকল্প রাস্তা খোঁজা ও পালানোর চেষ্টা। এখানে তার অহংকার ইগো কাজ করেছে। (৩)

এরপর রাজলক্ষ্মী বলল- 'অনেক দিন দেশে যাই নাই, আমি বারাসাতে যাইতে চাই'। সেখানে গিয়ে তার পুত্র বধুর প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে জান বিনোদিনীকে। তাকে দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করে- 'আহা, এই মেয়েই তো আমার বধু হইতে পারিত'। তারপর বিনোদিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে এল বাড়িতে। আশার সামনে বিনোদিনীকে স্থাপন করাতে একটি ইগোর সমাপ্তি হল। কারণ সে আশাকে হিংসা করত বলে। এবার রাজলক্ষ্মীর পাল্লা ভারি হওয়াতে তাচ্ছিল্যের সুরে আশাকে বলে- 'জান না যে-কাজ সে কাজে কেন হাত দেওয়া'। এখানে তার নির্বাচিত নারীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট। তাই- 'সময়ে- অসময়ে আশাকে বিশেষ করিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া বিনোদিনীর প্রশংসাবাক্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে'। এখানে ইগোর বীজ পুঁতে তাকে লালন-পালন করতে দেখা যায়। এখানে হিংসা ইগো কাজ করেছে। (৪)

ইতি মধ্যে বিনোদিনী ও আশার মধ্যে সখী সম্পর্ক হয়ে গেছে। বিনোদিনী নববধু আশা ও মহেন্দ্রের লীলা-খেলা যত শুনতে থাকে ততই তার অন্তরের মধ্যে জ্বালা শুরু হতে থাকে। তার মনে হিংসা জন্মাতে লাগলো এই ভেবে একদিন যা তার হতে পারত সে জিনিস আজ অন্যের। যতই তার ঘর দেখছে ততই সে প্রত্যখ্যানের বিষের জ্বালায় জ্বলতে থাকল। 'এই বিছানা, এই খাট তো একদিন তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিলো'। কিন্তু হোল না মহেদ্রের জন্য। তাই বিনোদিনী তার বিষের ছুরি মহেন্দ্রের বুকে বিদ্ধ করে দিয়েছে। তার প্রতিশোধ স্পীহা ইগো কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। দেখি বিনোদিনীর তীব্র হাসি যখন সে মনে মনে ভাবছে- মহেন্দ্র ছাদের শূন্য ঘরের কোনে বসে আক্রোশে ছটফট করছে আশার অপেক্ষায়। আর তাতে বিনোদিনী আনন্দ পাচ্ছে অন্যকে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বালিয়ে। 'এমন সুখের ঘরকন্না- এমন সোহাগের স্বামী। এ ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্বে, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। তখন কি এ ঘরের এই দশা, এ মানুষের এই ছিরি থাকিত। আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল'। এই ক্ষেদ প্রকাশের উদ্দেশ্য আশা নয় মহেন্দ্র। এক দিন এই মহেন্দ্রের দ্বারা যা হারিয়েছিল তাকেই সে পুনরায় ফিরে পেতে চায়। এই চাওয়াতেই বেঁধে যায় সংঘাত। হ্রাস পায় হিতাহিত জ্ঞান। তখন অন্যের আছে প্রকাশ পায় স্বার্থপর চরিত্র হিসেবে। এখানে সম্পর্ক ইগো কাজ করেছে। (২)

মহেন্দ্রের মনে পূর্বরাগের সৃষ্টি হয়েছে বিনোদিনীর রূপের বর্ননা শুনে। আর তারপরেই নিজেকে নিয়ে সংশয় –'তোমার সখীর যে রকম রূপের বর্ণনা কর, সে তো বড় নিরাপদ নয়'। তার রূপের লালসা থেকে আত্ম সংবরণ করা কঠিন কাজ। সেই ভয়ে সে দেখতে বা মিলতে চায় নি। বন্ধুত্ব প্রেম বিষয়ে মহেন্দ্র নিজেকে অত্যন্ত খুঁত-খুঁতে ও খাঁটি বলে গর্ব প্রকাশ করে। তার নিজের উক্তিতেই পাই- 'অহংকার করিয়া বলিত, আমার মতো অনন্যনিষ্ঠ প্রেম তোমার নহে'। তার এই গর্বই হচ্ছে ইগোর স্তম্ভ যা অন্যকে বিতাড়িত ও অবজ্ঞার দ্বারা নির্মিত হয়। পরক্ষনেই দেখতে পাই তার সেই অহংকার ধূলায় লুটিয়ে যেতে। বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের মধ্যে পূর্বরাগ তৈরি হল এবং পরবর্তীতে তা অভিমানের রূপ নিল। দুজনেই প্রতিজ্ঞা করল একে অপরের ইগো ভাঙ্গবে বলে। তার জন্য তারা ছলের পথ ধরল। এখানে অহংকার ইগো কাজ করেছে। (৩)

রূপের মোহে মহেন্দ্র ধরা পড়ল। তাকে পাওয়ার জন্য নানান পথ অবলম্বন করতে থাকল। অলিক নামে ডাকত, ফটো তোলার সাহায্য নিল। যাতে বনোদিনী ধরা পরে। অন্যপক্ষে বিনোদিনীও নানান কলাকৌশল অবলম্বন করল। সে বুঝল তার নির্মিত ফাঁদে মহেন্দ্র বেঁধেছে। এখানে বাসনা ইগো কাজ করেছে। (৬)

বিনোদিনীর ক্ষোভ –'পায়ের দাস করিয়া রাখিতাম' । তার ক্ষোভ ভালোবাসার অধিকারে পৌঁছেছে যখন মহেন্দ্রকে জোর করে –'কালেজে যাইতে হইবে.....কালেজে যাইবার কাপড় আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিল'। ক্রমশ আশার হাত হতে কর্তব্যভার তার নিজের হাতে কেড়ে নিচ্ছে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ছলে বলে কৌশলে রূপে বুদ্ধিতে এবং কর্মের মোহে

মহেন্দ্রকে জয় করল। সার্থ সিদ্ধিতে সকল ন্যায়- অন্যায়কে বিসর্জন দেওয়া অন্যায় কিছু নয় তা সে জানত। এখানে বাসনা ইগো কাজ করেছে। (৬)

তাদের সম্পর্কের মধ্যে বিহারীর প্রবেশ হওয়াতে মহেন্দ্রের মনে আবার নতুন করে ঈর্ষার জন্ম হল। তাকে নানা ভাবে সরানোর চেষ্টা। অন্য পক্ষে বিনোদিণী দেখল বিহারী তার ইচ্ছাকে বঞ্চিত না করে তার জন্য –'বিহারী সমস্ত মাটি করিতে আসিয়াছে' বলে ক্ষেদ প্রকাশ করছে। তার জন্য আশাকে বিহারীর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিনোদিনী বুঝল বিরোধে যা পাওয়া যায় না ভালোবাসায় তা পাওয়া সম্ভব –'যেখানে দাবী করা চলে সেখানে ভিক্ষা করা কেন। আদর যে কাড়িয়া লইতে পারেন'। তাকে প্রত্যখ্যান করা পুরুষের মধ্যে বিহারীও ছিল। তাই তাকেও ধরার চেষ্টা। দমদম বাগান বাড়িতে চড়িভাতিতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল যাতে বিহারীকেও কাছে পাবে এবং মহেন্দ্রর বুকেও ঈর্ষার জ্বালা হয়। যাতে বুঝতে পারে চোখের সামনে ভালবাসা অন্যের কাছে গেলে কি কষ্ট হয়। বিহারীকে সে সহ্য করতে পারছে না। সেটা বোঝা যাচ্ছে বিহারী সম্পর্কে এক দু কথার উত্তর পেয়ে। তার কাছে কর্মে ও গুণে ছোট হয়ে যাচ্ছে। তাই মহেন্দ্রের ইগো আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চড়িভাতির সময় বিনোদিনীর মধ্যে একটু ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে সেটা বিহারীর উপর। এখানে সম্পর্ক ইগো কাজ করেছে। (২)

রাজলক্ষ্মীর জ্বরে যখন বিনোদিনী সেবা করছে তখন অযথা মহেন্দ্র ঘোরাঘোরি করছে দেখে বিনোদিনী তাকে অকর্ম জ্ঞানেই বিবেচনা করে। কিন্তু তার পিছনে অনুসরণ করছে দেখে একটু সুখ ও গর্ব অনুভব করছে। তাকে কেউ এভাবে চাইতে পারে এই ভেবে। তার দুঃখ কষ্ট একটু লাঘব হল কারণ তার ঈপ্সিত ইগো প্রতিষ্টা লাভ করছে। যাকে গাঁয়ের মেয়ে বলে অবজ্ঞা করে খারিজ করে দিয়েছিল আজ তার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। এখানেও সম্পর্ক ইগো কাজ করেছে। (২)

অন্নপূর্ণা চলে গেছে। রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছে অনুসারে চলতে শুরু করেছে। কারণ সে ভাবত আশাকে চক্রান্ত করে এবাড়িতে ছেলের বউ করে এনেছে। এখন মহেন্দ্র সেই আশাকে ছেড়ে পড়ার নাম করে কলেজের পাশে থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করছে। বিনোদিনীকেও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছ এবং মহেন্দ্র আশার হাত থেকেও বাঁচবে। তাই সে আর আপত্তি করলো না। যাদের জন্য হিংসায় জ্বলে পুড়ে যায় আজ সে জ্বালা কমলো তাই আর মহেন্দ্রকে বাঁধা দিল না। এখানে হিংসা ইগো দেখা যায়। (৪)

একটা 'জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বলাইয়াছে, তাহা হিংসার না প্রেমের, না দুয়েরই মিশ্রন.....কোন নারী কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে'। এক মাত্র মহেন্দ্র বিনোদিনীর জীবনের সমস্ত সার্থকতা হতে ভ্রষ্ট করেছে এটা সে জানত। তার জন্য প্রতিহিংসায় বিনোদিনী নিজের মুখেই স্বীকার করেছে-'আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। কিন্তু যে কারণেই বলো , দগ্ধ হইতেই হউক বা দগ্ধ করিতেই হউক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত

প্রয়োজন'। এখানেই এই ইগো ধর্মী উপন্যাসের সর্বোচ্চ গ্রাফ পয়েন্ট দেখা যায়। এই যে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে একে কেন্দ্র করেই এই দ্বন্দ্বমূলক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করেছে। আর বাকি চরিত্র বা কাহিনি সাপোর্টিং এর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এর পরেই দেখতে পাই বিনোদিনী বলেছে- 'আমি হার মানিয়াছি, না তোমাকে হার মানাইয়াছি?' মহেন্দ্রের অবজ্ঞা এবং অহংকারের যে পরাজয় ঘটতে শুরু করেছে। তার উদ্দেশ্যেই এই উস্কানি মূলক বাক্য প্রয়োগ করেছে। বিনোদিনী এটাই চেয়েছে। তার ইগো স্বার্থকতা পেয়েছে। এখানে সম্পর্ক ইগো দেখা যায়। (২)

মহেন্দ্রও বুঝতে পারলো যে তার অহংকারে পতন ঘটতে শুরু করেছে। তার জীবন চক্রটা যে অহংকারে পূর্ণ ছিল সে তখন বুঝতে পারেনি। তাই এই ঘটনাকে সে পৈশাচিক ইন্দ্রজাল বলে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে, যা তার প্রকৃতিগত স্বভাব। এখানে অহংকার ইগো কাজ করেছে। (৩)

এই ঘটনার পর বিনোদিনীর মনে একটু দ্বিধার আবির্ভাব ঘটে আশার কথা চিন্তা করে। এমন সরলা মেয়ের সাথে কি এমন আচরণের শোভা পায় ভেবে। তাই নিজেকেই একটু অলক্ষণা বলে ধিক্কার দেয়। তাই তার অনুশোচনা হয় এর হাত থেকে মুক্তির জন্য। কিন্তু আশা তার লক্ষ্য নয় সে তো তার রাস্তায় এসে পড়েছে। যেমন বিনোদিনীর জীবন পথে অবহেলা ও অবজ্ঞা এসেছে। এখানে সম্পর্ক ইগো দেখা যায়। (২)

মহেন্দ্র তার চাওয়াকে বিনা বাঁধায় পাওয়ার জন্য আশাকে কাশী পাঠানোর ব্যবস্থা করে। বিহারীকেও রাস্তা থেকে সরানোর চেষ্টা। এখানে বাসনা ইগো দেখা যায়। (৬)

তার আগে সে রাগের মাথায় বলেছে যে সে বিনোদিনীকে ভালোবাসে না। আর এই 'না' এর মধ্যে রয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ সূচক বর্তমান। আর তার এই ভালোবাসার কথাটা প্রকাশ পেত না সবার সামনে যদি না সে রেগে যেত। রাগ বা ক্রোধ যে সর্বনাসের মূল তা কিছু পরেই দেখা যায়। এর পরে মহেন্দ্রেও ভয় হল এই ভেবে যার জন্য এতো কিছু এবার সে কি ভুল বুঝবে। এখানে ক্রোধ ইগো কাজ করেছে। (১)

যখন বিনোদিনীর কানে এই 'ভালোবাসে না' শুনতে পেল তখন ভাবল এই বিশ্ব সংসারের সবাই তার থেকে বিমুখ। অপর দিকে বিহারীর কাছ থেকেও কোন আশার আলো দেখতে পেল না। সে যা চায় তাতেই বাঁধা? কোন চাওয়াই তার স্বার্থকতা পায় না। কোন সুখই লাভ করতে পারে না। তখন তার মনের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল। যে করেই হোক তার সকল বাঁধা অতিক্রম করে প্রতিশোধ নিতেই হবে। 'সুখ যদি না পাইল, তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত সম্ভবপর সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে পরাস্ত ধূলিলুণ্ঠিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনের কর্ম সমাধা হইবে'। এই উক্তিতে বোঝা যায় যে মানুষের যখন সকল রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় তখন পৃথিবীর সকল কিছুকে জ্বালিয়ে ছার খার করতেও দ্বিধা বোধ করে না। ভাল মন্দের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। ভালোবাসার

প্রত্যখ্যান থেকেই ক্রোধের জন্ম সেখান থেকেই প্রতিহিংসার রূপ লাভ করে। যা বিশ্ব সংসারকে জ্বলিয়ে ছারখার করে দেয়। তা করতেই এখন সে বদ্ধ পরিকর। এখানে সম্পর্ক ইগো দেখা যায়। (২)

এতদিন পর রাজক্ষ্মীর মনে পরিতৃপ্ত হয়েছে। আশা বাড়িতে নেই সেই ফাঁকে বিনোদিনীকে তার ছেলের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার হিংসা দমন হল। এখানে হিংসা ইগো কাজ করেছে। (৪)

মহেন্দের কাছে বিনোদিনী এসেছে এতে মহেন্দ্র ভেবেছে তার ইচ্ছা পূর্নতা পেয়েছে। বিনোদিনী তার কপাল টিপে দিচ্ছে। তার সঙ্গে রঙ্গ তামাসা করছে। বিনোদিনীর রূপে পরাজিত হয়েছে। তাকে আরও একান্ত ভাবে পেতে তার পা জড়িয়ে ধরতেও দ্বিধা নেই। পাওয়াই একমাত্র কাম্য মনে করেছে। অন্য পক্ষে এটা যে উল্টো তা কখনই তার অহংমনে উদয় হয় নি। এখানে অহংকার ইগো কাজ করেছে। (৩)

সে যে বিনোদিনীর পাতা ফাঁদে ধরা পড়েছে। এতে বিনোদিনীর মন শান্তি পেয়েছে তার আভাস পাই – 'তোমার ভালোবাসা পায়ে ঠেলিব না- মাথায় করিয়া রাখিব'। এই উক্তিতে মহেন্দ্র ভাবল তার অভীষ্ট লাভ হয়েছে। কিন্তু এখন কোথায় সেই ইগো যার জন্য বিনোদিনীকে প্রত্যখ্যান করেছিল, কোথায় তার কোলকাতার আধুনিক শিক্ষা। প্রেম ভালোবাসায় সকল ইগো লুপ্ত হয়ে যায়। সে শান্তি-শতক পড়ছে। কিন্তু বিনোদিনী তার কাছে ধরা দেয় নি। শুধু ভান করছে। ছলনা করে তাকে আবদ্ধ রেখে একটু একটু করে বিষে দগ্ধ করছে। তখন মহেন্দ্র বলছে– কেন তুমি আমাকে পীড়ন কর- কেন তুমি আমাকে দগ্ধ কর। এই দগ্ধ ও পীড়নের মধ্যে বিনোদিনী শান্তি পায়। সে জানে মহেন্দ্রকে পাওয়া যাবে না কিন্তু কষ্ট দেওয়া যাবে। শিকারি কখনও তীরের যন্ত্রনা উপভোগ করে না যতক্ষণ না তার বুকে তীর বিদ্ধ হয়। আর সেটা উপলব্ধি করানোর জন্যই এই প্রতিঘাত দেওয়া। তার ভালোবাসা বিহীন খরা জীবন যৌবন বিনা সুখেই শুকিয়ে যাচ্ছে। আর মহেন্দ্রদের মত পুরুষেরা ইচ্ছে মত একাধিক জীবন নষ্ট করবে। অতি আদরে তিন জনের খাবার ধ্বংস করবে। তা কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না বলেই বিনোদিনী এই শিক্ষা দেওয়ার রাস্তা গ্রহণ করেছে। বিনোদিনী সারা জীবন দুঃখ পেয়েছে আর মহেন্দ্র অহংকার পূর্ণ জীবন নিয়ে থাকবে তা কিছুতেই হতে দেওয়া যাবেনা। তাই তাকেও দুঃখের জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তা বিনোদিনী নিজেই স্বীকার করেছে- সে তার সাথে খেলা করেছে, তাকে শিক্ষা দিয়েছে, তার অহংকার ধূলায় মিশিয়েছে। যে সর্বদা অন্যকে দুঃখ কষ্ট দিয়েছে সে কি করে বুঝবে দুঃখের ব্যাথা। এতো দিন যে দুঃখ ছিল বিনোদিনীর কাছে আজ সেটা পৌছে গেছে মহেন্দ্রের কাছে। সে রাগে সকল কিছুকে অবজ্ঞা করে বিনোদিনীর হাত ধরে বেরিয়ে পড়েছে। সব ছেড়ে বিনোদিনীকে নিয়ে থাকবে। আর এটাই বিনোদিনী চেয়েছে। অগ্নিসম ক্রোধ আশার সংসারকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছে। ক্রোধ ইগো যে কতটা ধ্বংসাত্মক তাই লেখক দেখিয়েছে। এখানে সম্পর্ক ইগো কাজ করেছে। (২)

৩৩ পরিচ্ছেদে দেখতে পাই দুই ঈর্ষান্বিত নারীর সংঘাত। রাজলক্ষ্মী ও বিনোদিনী একে অপরকে মায়াবিনী বলে অভিযোগ করে। একের ঈর্ষা ইগো অপরের জীবনে কতটা দুঃখ বয়ে আনে সেটাই বিনোদিনী বুঝিয়ে দিয়েছেন। অন্যকে যেমন দুঃখ দেবে তেমন নিজেও ভোগ করবে। রাজলক্ষ্মীকে দেখে তার মনের অগ্নি পুনরায় জ্বলে উঠল। সেও প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। কারণ রাজলক্ষ্মী এমন চেয়েছিল। সেটা বিনোদিনী বুঝেছিল। এখন কাজ মিটে গেছে বলে তাকে ভৎসনা দিচ্ছে। তাই সে মহেন্দ্রের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এখানে হিংসা ইগো দেখা যায়। (৪)

তারা পটল ডাঙ্গায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকছে। মহেন্দ্রের এই পাওয়ার ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে তার অর্থ মান আত্মীয় সব খোয়াতে হয়েছে। শুধু মাত্র ইগোর খোরাক মিটাতে। এমন কি মনের শান্তিও গেল। তার পরিবর্তে সে কিছুই পেল না। এলাহাবাদে থাকার সময় বিহারীর জন্য হিংসা ও বিনোদিনীর প্রতি অবজ্ঞায় মনের দুঃখ জ্বালায় বলে ফেলেছে- 'ছুরি দিয়া কাটিয়া তোমার বুকের ভিতর হইতে তাহাকে বাহির করিব'। এ যেন অসহ্য যন্ত্রণায় বুকের ক্ষত স্থানে বাক্যের দ্বারা ক্ষত নিবারণের চেষ্টা। বিনোদিনীর এক ধাক্কায় মহেন্দ্রর অহংকার যখন ধূলায় মিশে গেছে তখন বুঝল- 'এই সামান্য এক স্ত্রীলোকের কাছে আমি নিজেকে এতই হীন করিয়াছি'। এক মুচ্ছাতেই তার জ্ঞান ফিরে পেল। এখানে সম্পর্ক ইগো দেখা যায়। (২)

আবার মহেন্দ্র শেষের দিকে আর আশার সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। তার কৃত কর্মের জন্য অপরাধ বোধ কাজ করছে। সেই অপরাধের জন্য সে লজ্জিত। নিজের স্থান গ্রহণ করার সাহস পাচ্ছে না। অর্থাৎ এখানে লজ্জা ইগো কাজ করেছে। (৭)

অন্যপক্ষে আশার চরিত্র প্রথম থেকে অতি সরল চললেও আস্তে আস্তে তার মানসিকতা পাল্টে যায়। যখন মহেন্দ্র বাড়ি থেকে চলে যায়। রাজলক্ষ্মীকে সেবার মধ্য দিয়ে তার অধিকার পেয়েছে। তখন মহেন্দ্রকে আর শ্রদ্ধা করে না। বিহারীর উপর ভরসা রাখছে। তার পরেই তার চরিত্রের গ্রাফ উর্ধোমুখি হয়েছে। সকলের ব্যবহারে তার প্রচন্ড রাগ হল। সেই রাগই তাকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারীতে রূপান্তরিত করল। এই তৈরির পিছনে আছে তার ক্রোধ। যার জন্য সে নিজ আসনে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ তার মধ্যে ক্রোধ ইগো কাজ করেছে। (১)

সমস্ত উপন্যাস জুড়ে রবীন্দ্রনাথ সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ইগো সমাজের পক্ষে কতটা ক্ষতি কারক। যে কোন ইগো পতনের মূল, লেখক সেটাই দেখিয়েছেন এই প্লট নির্মান করে। গোটা মানব জাতি ইগোর দ্বারা পরিচালিত সেটাই এই রচনায় দেখানোর উদ্দেশ্য। ইগোই মানুষকে দুঃখের পথে ঠেলে নিয়ে যায়। মন মান ধন সমাজ রাষ্ট্র ভালোবাসা সম্পর্ককে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। আর এটা আমরা সাহিত্য তথা ইতিহাসের পরতে পরতে দেখতে পাই কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষ তার পরেও একে নিয়ে থাকে। বিগত অবিজ্ঞতা থেকে কোন শিক্ষা নেয় না এই মানব সমাজ। তাই বলা যায় মানুষ দুঃখকেই বোধহয় ভালোবাসে। যার কিছু নেই তারও ইগো আছে।

তথ্যসূত্রঃ

1. রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র, ২০১০, শুভম, কলকাতা
2. বঙ্কিম রচনাবলী, ২০০৬, দে'জ পাবলিশং, কলকাতা
3. সিগমুন্ড ফ্রয়েড; মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা, ১৯৯৪, পুষ্পা মিশ্র, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি লিমিটেড, কলকাতা
4. ফ্রয়েড; সুনীল কুমার সরকার, ১৯৮০, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা
5. উপন্যাসের কথা; দেবীপদ ভট্টাচার্য, ২০০৩, দে'জ পাবলিশং, কলকাতা
6. অগ্রন্থিত বাংলা রচনা; গিরীন্দ্রশেখর বসু, ২০১৭, অনুষ্টুপ, কলকাতা
7. সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ; সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ২০০৩, দে'জ পাবলিশং, কলকাতা
8. সাহিত্য- বিচারঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ; বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, ২০০৬, দে'জ পাবলিশং, কলকাতা
9. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা; শ্রীশ্রীকুমার বন্ধ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৬, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
10. সাহিত্য প্রকরণ; হীরেন চট্টোপাধ্যায়, ২০১৭, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা
11. নন্দনতত্ত্বের প্রথম পাঠ; কামরুল হায়দার, ২০১৭, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ
12. সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যপ্রসংগ ও সমালোচনা বিচিত্রা; দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, ২০০৭, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা
13. উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম; প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত, ২০০৬, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা
14. সাহিত্যতত্ত্ব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য; হীরেন চট্টোপাধ্যায়, ২০১০, দে'জ পাবলিশং, কলকাতা
15. Stanford Encyclopedia of Philosophy; Egoism, Nov 4, 2002 online e-source
16. Egoism; Wikipedia the free encyclopedia, online e-source
17. Egoism; online e-source etc.